অমৃতের হকদার

বাজেটের পূর্বাহ্ণে এই সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছিল— প্রতি বাজেটেই যে প্রতিশ্রুতির বন্যা বহিয়া যায়, শেষ অবধি সেই প্রতিশ্রুতিগুলির কী গতি হয় (‘ভ্রান্ত অতীত’, ৩১-১)। সেই আলোচনায় যে তিনটি ক্ষেত্রকে বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল— যথাক্রমে বিলগ্নিকরণ, মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা যোজনা, এবং পরিকাঠামো খাতে লগ্নি— এই বাজেটে উল্লেখ বা অনুল্লেখে এই তিনটি ক্ষেত্রই বিশেষ ভাবে দৃশ্যমান। ২০২১-২২ অর্থবর্ষের বাজেটে বিলগ্নিকরণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির হইয়াছিল ১,৭৮,০০০ কোটি টাকা। প্রকৃত বিলগ্নিকরণের পরিমাণ, পূর্ববর্তী অর্থবর্ষগুলির ধারা অনুসরণ করিয়াই, লক্ষ্যসীমার ধারেকাছেও পৌঁছায় নাই। সম্ভবত সেই কারণেই এই বাজেটে বিলগ্নিকরণের লক্ষ্যমাত্রা ছাঁটিয়া গত বাজেটের এক-তৃতীয়াংশে লইয়া আসিয়াছেন অর্থমন্ত্রী। এক অর্থে, কাজটি ভালই করিয়াছেন। প্রতি বৎসর সরকারকে বিলগ্নিকরণের ক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে দেখিলে বাজারের মনে যে সংশয়গুলি তৈরি হয়, তাহা সরকারের পক্ষে সুসংবাদ হইতে পারে না। রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদের কতখানি বিক্রয়ের যোগ্য, এই প্রাথমিক ধারণাটুকু সরকারের আছে, এই কথাটি প্রমাণ করা জরুরি। কিন্তু, প্রশ্ন হইল, বিলগ্নিকরণ প্রক্রিয়া যদি গতিশীল না হইতে পারে, তাহা হইলে পরিকাঠামো খাতে নূতন লগ্নির অর্থসংস্থান হইবে কোন পথে? এই বাজেটে অর্থমন্ত্রী ন্যাশনাল মনিটাইজ়েশন পাইপলাইন-এর নামমাত্র আছে। তাহাতে কাজ হইতেছে অথবা হইবে কি না, জানা প্রয়োজন।

এই প্রশ্নটি বর্তমান বাজেটের পর আরও গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সিকি শতাব্দীর মেয়াদে যে উন্নয়ন পরিকল্পনা শুনাইয়াছেন, তাহার সফল রূপায়ণ যদি করিতে হয়, তবে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। তাহার সংস্থান কী উপায়ে হইবে, এই বাজেটে তাহার স্পষ্ট দিগ্‌নির্দেশ নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে হয়, জিডিপি-র অনুপাতে কর আদায়ের পরিমাণ ভারতে এখনও কম। অর্থের জোগানের পথগুলি খুলিবার কথা ভাবিতে হইবে। তবে, পরিকাঠামোয় আদৌ বিনিয়োগ প্রয়োজন হইবে, না কি বাজেট-ঘোষণাগুলি শুধু কথার কথামাত্র, সেই প্রশ্নের অবকাশ থাকিতেছে। এই বাজেটে সড়ক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় লগ্নির পরিমাণ বাড়িয়াছে প্রায় সত্তর শতাংশ; রেলের বাজেটও বাড়িয়াছে ২৭.৫ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি যোজনায় সামগ্রিক লজিস্টিক্স ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার উপর জোর দিয়াছেন অর্থমন্ত্রী। তাহার বাস্তবায়ন হইলে সত্যই অর্থব্যবস্থায় নূতন গতির সঞ্চার হইতে পারে। কিন্তু, পরিকাঠামো গড়িয়া তুলিলেই উৎপাদন বাড়িবে, এই বিশ্বাসটিকে স্বতঃসিদ্ধ ধরিয়া লইবার বিপদ আছে, অর্থমন্ত্রীকে তাহাও স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

বাজেট বক্তৃতায় অনুপস্থিতির কারণে বিশেষ ভাবে দৃশ্যমান হইয়াছে মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা যোজনা, এবং জাতীয় খাদ্য নিশ্চয়তা আইনের অনর্গত গণবণ্টন ব্যবস্থা। প্রথমটির ক্ষেত্রে

বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ২০২১-২২ অর্থবর্ষের প্রকৃত বরাদ্দ অপেক্ষা ২৫,০০০ কোটি টাকা কমিয়াছে; দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণ গত বাজেট বরাদ্দের তুলনাতেই কম। অনুমান করা চলে, অর্থশাস্ত্রীরা এই প্রকল্প দুইটিকে যতখানি গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বোধ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার তাহা করে না। কিন্তু, এই প্রকল্পগুলি অর্থাভাবে পঙ্গু হইয়া গেলে কোন উপায়ে দরিদ্র মানুষের পাতে অন্নের সংস্থান হইবে, কী ভাবেই বা তাঁহাদের আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইবে, অর্থমন্ত্রী জানান নাই। ট্রিকল ডাউন অর্থনীতির তত্ত্বের উপর সব দায়ভার ছাড়িয়া দিলে যে মুশকিল, এই কথাটি তাঁহারা স্বীকার করেন কি না, এই বাজেটে স্পষ্ট হইল না। সম্ভবত, সব সহ্য করিয়াও আগামী পঁচিশ বৎসর যাঁহারা বাঁচিয়া থাকিবেন, তাঁহারাই অমৃতের প্রকৃত হকদার।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER.COM

দিশাহীন

কেন্দ্রের বাজেট দেখিয়া ক্ষুব্ধ কৃষকরা অভিযোগ করিয়াছেন, তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে প্রতিহিংসা। প্রকৃত চিত্রটি আরও উদ্বেগজনক। এই বৎসর কৃষির বরাদ্দ যে চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছে, তাহা এক প্রকার হতাশার অভিব্যক্তি। ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের কৃষকদের আয় পাঁচ বৎসরে দ্বিগুণ করিবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইবার আশা সামান্য, তাহা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই বাজেটে নূতন লক্ষ্য স্থাপন করিবার পরিবর্তে সরকার যেন কৃষি হইতে মুখ ফিরাইল। কৃষিক্ষেত্রে সামগ্রিক বরাদ্দ কার্যত বাড়ে নাই, বরং সামগ্রিক বাজেটে কৃষির ভাগ কমিয়াছে— গত বৎসর যাহা ৪.৩ শতাংশ ছিল, তাহা হইয়াছে ৩.৮ শতাংশ। কৃষকের ক্ষতির ঝুঁকি কমাইতে এবং কৃষি বিপণনে গতি আনিতে বেশ কয়েকটি প্রকল্প গত কয়েক বৎসরে ঘোষিত হইয়াছিল। সেইগুলিতেও যে বরাদ্দ কমিয়াছে, তাহা ভাল লক্ষণ নহে। যেমন প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় বরাদ্দ কমিয়াছে। ইহা হয়তো অপ্রত্যাশিত নহে— গুজরাত, পশ্চিমবঙ্গ-সহ বেশ কিছু রাজ্য ওই প্রকল্প হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে; কৃষিঋণ হইতে বিমা বিযুক্ত হইবার পরে চাষিরাও বিমায় আগ্রহী হয় নাই। কিন্তু এই সঙ্কোচন সমগ্র প্রকল্পটির কার্যক্ষমতা বিঘ্নিত করিতে পারে। স্বল্পমেয়াদি কৃষিঋণে সরকারি ভর্তুকির জন্য বরাদ্দও যৎসামান্য বাড়িয়াছে। প্রধানমন্ত্রী কিসান সম্মান নিধিতে বরাদ্দ গত বৎসরের তুলনায় বাড়িয়াছে অতি অল্প, অতএব অনুদানের দ্রুত সম্প্রসারণের আশা নাই। শুষ্ক অঞ্চলে সেচের জন্য ‘প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা’ এই বৎসর অনুল্লিখিত রহিয়াছে, গত বৎসরের বরাদ্দ চার হাজার কোটি টাকার অর্ধেক খরচ হয় নাই। ‘প্রধানমন্ত্রী’ পদটি উল্লেখ করিয়া যে প্রকল্পগুলির বিশেষ গুরুত্ব বোঝানো হইয়াছিল, সেইগুলিও কার্যত উপেক্ষিত রহিয়া গেল। নূতন দিশা দেখাইতে সমগুরুত্বের কোনও প্রকল্প ঘোষিত হইল না, কেবল গঙ্গার ধারে জৈব চাষের স্বপ্ন বপন করা হইল।

ইহাতে উদ্বেগ জাগিতে বাধ্য। বহু বৎসর ধরিয়া ভারতের কৃষিক্ষেত্রটি অবহেলিত হইয়াছে, ফলে কৃষি ক্রমশ অলাভজনক হইয়াছে। পরিশ্রমী এবং কুশলী চাষিও চাষ ছাড়িতেছেন। মোড় ঘুরাইতে প্রয়োজন আইন ও বিধিতে সংস্কার, পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিপণন ব্যবস্থার উন্নতি, প্রভৃতি। তাহার সামান্যই হইয়াছে। পরিবেশ-বান্ধব, বিজ্ঞানসম্মত, উন্নত প্রযুক্তিচালিত কৃষির লক্ষ্যে কোনও নিবিড় পরিকল্পনা এখনও অবধি মেলে নাই। এই বৎসরও তাহার আশা স্তিমিত করিল কৃষি শিক্ষা ও গবেষণায় বরাদ্দে কার্পণ্য। কৃষকের প্রশিক্ষণ, কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রাণিবিজ্ঞান, মৎস্যবিজ্ঞানের গবেষণা হইতে রাজ্যগুলির কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনুদান, সকলই কমিয়াছে। অথচ, সকল উন্নত দেশ বিজ্ঞানের সহায়তাতেই কৃষির উন্নতি করিয়াছে। কৃষকের আয়বৃদ্ধি করিতে চাহিলে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ প্রয়োজন। সরকার কেবলই দায় সারিতেছে। ফলে, কৃষকের আয়বৃদ্ধির আশা ক্রমেই সুদূরপরাহত হইতেছে।

সঙ্কটাপন্ন রোগীকে অক্সিজেন জুগাইবার মতো, কৃষিকে বাঁচাইবার শেষ উপায় সরকারি ক্রয়। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ঘোষণা করিয়াছেন, এই বৎসর ২.৩৮ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে ন্যায্য মূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয়ের জন্য। ইহা গত বৎসরের প্রকৃত খরচের তুলনায় কম। বিনামূল্যে শস্য বিতরণ ক্রমে কমাইবে কেন্দ্র, ইহা হয়তো তাহারই ইঙ্গিত। যদিও কৃষক আন্দোলনের কেন্দ্রে ছিল সরকারি ক্রয়ের নিশ্চয়তার দাবি। তবে কেবল খাদ্যশস্য নহে, বাজারে দাম পড়িলে দ্রুত ফসল কিনিবার প্রকল্পে (প্রাইস সাপোর্ট স্কিম) বরাদ্দও অনেকটা কমিয়াছে। অর্থাৎ কৃষিকে স্বনির্ভর করিবার দিশা নাই, কৃষকের সহায়তা পাইবার আশাও তেমন নাই। কৃষক ক্ষুব্ধ হইবেন, আশ্চর্য কী।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER.COM

মহাকালের বাজেট

জন মেনার্ড কেন্‌স হয়তো বলিতেন, অতি দীর্ঘমেয়াদে আমরা সবাই অতি মৃত! অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন যে বাজেট পেশ করিয়াছেন, তাহার রূপরেখার পরিধি ঠিক মহাকালের সমান না হইলেও নেহাত কম নহে— সিকি শতাব্দী। সেই দীর্ঘমেয়াদে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগের কথা বলিয়াছেন অর্থমন্ত্রী। তাহার কয় আনা এই অর্থবর্ষের ভাগে পড়িবে, সেই হিসাব এখনও ধূসর। মূলধনি খাতে ব্যয়বৃদ্ধির যে হিসাব অর্থমন্ত্রী পেশ করিয়াছেন, তাহাতেও সংশয়ের অবকাশ রহিয়াছে। যেমন, মূলধনি খাতে খরচ বাবদ রাজ্যগুলিকে যে বিশেষ ঋণ দিবে কেন্দ্র, তাহাই এই বর্ধিত বরাদ্দের প্রায় অর্ধেক। গত বৎসরের বাজেট জুড়িয়া ছিল ‘ন্যাশনাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার পাইপলাইন’। এই বৎসর অর্থমন্ত্রী তাহার উল্লেখই করিলেন না। এই বৎসরের আকর্ষণ: প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি প্রকল্প। অবশ্য,

পাইপলাইনে যাহা ছিল, এই প্রকল্পেও তাহার একটি বড় অংশ আছে। নাম পাল্টাইল, কিন্তু তাহাতে এই খাতে লগ্নির অভাব পাল্টাইবে কি? শিক্ষা, স্বাস্থ্যে ডিজিটাল পদ্ধতির অধিকতর প্রচলনের কথা বলিয়াছেন অর্থমন্ত্রী। কিন্তু, সেই ক্ষেত্রগুলিতে ব্যয়বরাদ্দ বাড়িয়াছে অতি সামান্য— মূল্যস্ফীতির পরিমাণটি বাদ দিলে উভয় ক্ষেত্রেই বরাদ্দ কার্যত বাড়ে নাই বলিলেই চলে। ডিজিটাল ব্যবস্থা আসিয়া কি এই ঘাটতি দূর করিতে পারিবে?

জোগান-নির্ভর আর্থিক পুনরুত্থানের নীতিটি কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়িতে নারাজ। কিন্তু, যেখানে বাজারে চাহিদার অভাব, সেখানে উৎপাদনে প্রণোদনা দিয়া, অথবা সহজলভ্য ঋণের ব্যবস্থা করিয়া বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব কি? সমস্যাটি সম্বন্ধে অর্থমন্ত্রী বিলক্ষণ অবহিত। বাজেট ভাষণে তিনি বলিলেন যে, সরকারকেই লগ্নির ক্ষেত্রে অগ্রদূতের ভূমিকা লইতে হইবে। এই বাজেটে তাহার লক্ষণও উপস্থিত— গত বাজেটে রাজস্ব খাতে ব্যয়ের অনুপাতে মূলধনি খাতে ব্যয় ছিল মাত্র ১৯.৫%; এই বাজেটে তাহা বাড়িয়া ২৪% হইয়াছে। কিন্তু, তাহার সীমাটিও খুব স্পষ্ট। সরকারের হাতে বিনিয়োগ করিবার মতো টাকা কোথায়? বিলগ্নিকরণের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় হইলে সেই টাকা মূলধনি লগ্নি হইতে পারিত। গত তিন বাজেটের বিলগ্নিকরণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই— বর্তমান বাজেটে লক্ষ্যমাত্রাটিই গত বারের এক-তৃতীয়াংশ। ফল যাহা হইবার, তাহাই হইতেছে।

পঁচিশ বৎসর পরে এই বাজেটের কী সুফল ফলিবে, সেই প্রশ্নের উত্তরের জন্য পঁচিশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে— কিন্তু, দেশের সম্মুখে এই মুহূর্তে যে সমস্যা, এই বাজেটে তাহার সমাধান নাই। অতিমারির ধাক্কায় বহু মানুষ দারিদ্রের অতলে তলাইয়া যাইতেছেন। চাকুরি নাই, আয় নাই। ফলে, বাজারে চাহিদাও নাই। মানুষের হাতে ক্রয়ক্ষমতা তৈয়ারি করিবার জন্য কোনও পদক্ষেপ অর্থমন্ত্রী এই বাজেটে করিলেন না। সেই অবহেলার একটি বড় উদাহরণ গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প (এনআরইজিএ)। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে এই প্রকল্পে ব্যয়ের সংশোধিত অনুমানের তুলনায় বাজেট বরাদ্দ কমিল ২৫,০০০ কোটি টাকা। যখন দারিদ্র বাড়িতেছে, এবং তাহারও অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে বাড়িতেছে অসাম্য, তখন ন্যায় এবং সমতার খাতিরেই সামাজিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ছিল। তাহাতে জোগান-নির্ভর নীতিরও সুবিধা হইত। বাজারে চাহিদা ফিরিলে স্বভাবতই লগ্নির চাহিদাও বাড়িত। অর্থমন্ত্রী সেই পথে হাঁটিলেন না। মূল্যস্ফীতির আগুনে যখন গরিব মানুষ ঝলসাইয়া যাইতেছেন, তখন গণবণ্টন ব্যবস্থার বরাদ্দও ছাঁটিয়া দিলেন অর্থমন্ত্রী। ড্রোন-নির্ভর, ডিজিটাল ভারতে বুঝি এই মানুষগুলির আর দরকার পড়িবে না। অথবা, মহাকালের হিসাব কষিতে গিয়া অর্থমন্ত্রী বর্তমানকে অবজ্ঞা করিলেন। সেই কাজটি কতখানি হঠকারী হইল, সেই উত্তরের জন্য মহাকালের অপেক্ষায় থাকিবার প্রয়োজন নাই।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER.COM

প্রকল্পের ফাঁদ

ভারতের সর্বংসহ গণদেবতাও যে দুই একটি বিষয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, অনাহার তাহার মধ্যে একটি। সম্ভবত বহু দুর্ভিক্ষের স্মৃতি প্রজন্ম হইতে প্রজন্মান্তরে বহন করিতেছে বলিয়াই অনাহারের সম্ভাবনা মানুষকে বিচলিত করে। শুধু নিজের অনাহার নহে— অন্যেরও। সামাজিক ক্ষেত্রে অতিবিরল সর্বজনীন সহমর্মিতার একটি নির্ভুল উদাহরণ এই ক্ষেত্রে বারংবার মিলে। সেই কারণেই কোনও সরকারই ক্ষুধা বা অনাহার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রকাশ করিতে চাহে না। শীর্ষ আদালত সম্প্রতি মনে করাইয়া দিল, রাজ্যগুলি অনাহারে মৃত্যুর পরিসংখ্যান প্রকাশ করে নাই বলিয়া মৃত্যুও ঘটে নাই, ইহা ধরিয়া লওয়া চলে না। বহু মানুষ ক্ষুধার্ত থাকিতেছেন, অনাহারে মৃত্যুও ঘটিতেছে। প্রধান বিচারপতি এন ভি রমণার বেঞ্চ অপুষ্টির সমস্যা হইতে পৃথক ভাবে গুরুত্ব দিয়াছে ক্ষুধাকে। ভারতে অপুষ্টি দীর্ঘ দিনের সমস্যা, খাদ্যাভাব তাহার একমাত্র কারণ নহে। খাদ্যাভ্যাস, শৌচাগার ব্যবহারের অভ্যাস, নানাবিধ অসুখ প্রভৃতি অনেক কারণের জন্য অপুষ্টি ঘটিয়া থাকে, তাই তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও নিবিড় ও দীর্ঘমেয়াদি হইবে, ইহাই প্রত্যাশিত। কিন্তু ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা আপৎকালীন ভিত্তিতে করা প্রয়োজন, সেখানে সরকারি কার্যসূচির পরিচিত গয়ংগচ্ছ ভাবটি চলিবে না। বিশেষত অতিমারি এবং তজ্জনিত আর্থিক সঙ্কট ক্ষুধার প্রকোপ বাড়াইয়াছে, এই কথা নানা বেসরকারি সমীক্ষা ও পর্যালোচনায় মিলিয়াছে, কিন্তু সরকার এ বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করে নাই। এই বক্তব্যের যথার্থতা সংশয়াতীত।

তবে সরকারের কর্তব্য নিরূপণে শীর্ষ আদালতের পরামর্শটি লইয়া চিন্তার প্রয়োজন রহিয়াছে। আদালত বলিয়াছে ক্ষুধা নিবারণে কোনও নূতন প্রকল্প শুরু করা প্রয়োজন, যেমন গণরসুই চালু করিয়া রান্না করা খাবার বিতরণ। কেন্দ্র এই মডেল তৈরি করিলে রাজ্যগুলি তাহার অনুসরণ করিবে, এমনই আশা প্রকাশ করিয়াছেন বিচারপতিরা। প্রশ্ন উঠিবে, অন্নের ব্যবস্থা করা অবশ্যই সরকারের কাজ, কিন্তু তাহার জন্য কি নূতন প্রকল্প প্রয়োজন? রান্না-করা খাবার সুলভে অথবা বিনামূল্যে দিবার প্রকল্প বহু রাজ্য নানা সময়ে মহা আড়ম্বরে চালু করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও গত বিধানসভা নির্বাচনে ‘মা’ ক্যান্টিন খুলিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, কিছু স্থানে শুরুও হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্য সে সব প্রকল্প নিয়মিত চালাইতে পারে নাই। পরীক্ষামূলক প্রকল্পের মডেল প্রয়োজন, কিন্তু গণরসুই বহু-পরীক্ষিত ধারণা। তাহার মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষমতা আছে, কিন্তু ক্ষুধার সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথ তাহা নহে। শীর্ষ আদালত গণরসুইয়ের জন্য রাজ্যগুলিকে বাড়তি খাদ্যশস্য জুগাইবার পরামর্শ দিয়াছে। কিন্তু গণরসুইয়ের জ্বালানি, রন্ধন-উপকরণ, রন্ধনকর্মীর পারিশ্রমিক প্রভৃতির খরচ চাল-গমের খরচকে ছাড়াইয়া যায়। অতএব কেন্দ্র কেবল বাড়তি শস্য দিয়া দায় সারিলে তাহা রাজ্যগুলির প্রতি অন্যায় হইবে।

ক্ষুধার ভয়ঙ্কর ও অসহ সমস্যার সমাধান করা জরুরি। কিন্তু, তাহার জন্য নূতন প্রকল্পও প্রয়োজন নাই, দেখনদারিও নহে। মিড-ডে মিল অথবা অঙ্গনওয়াড়ির মতো প্রকল্প দীর্ঘ দিন চালু রহিয়াছে, কিন্তু বহু রাজ্য রান্না-করা খাবার বিতরণ স্থগিত রাখিয়াছে অতিমারিতে। কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের মাসগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল, শিশু ও গর্ভবতীদের কিছুই মেলে নাই। গণবণ্টন ব্যবস্থার যে নেটওয়ার্ক ভারতে রহিয়াছে, তাহারও যথাযথ ব্যবহার হয় না। পুরাতন প্রকল্পগুলির যথাযথ রূপায়ণ না করিয়া নূতন প্রকল্প চালু করিয়া কী লাভ হইবে? ক্ষুধার নিরসনে আপৎকালীন ভিত্তিতে কাজ প্রয়োজন, সুপ্রিম কোর্টের এই কথাটি শিরোধার্য। কিন্তু কী উপায়ে তাহা হইবে, সেই সিদ্ধান্ত প্রশাসনের উপরেই ছাড়িতে হইবে।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER.COM

মৃত্যুফাঁদ

এই বৎসর প্রজাতন্ত্র দিবসে দুর্গাপুরের ফরিদপুর-লাউদোহা ব্লকে খোলামুখ কয়লাখনিতে কয়লা আহরণ করিতে গিয়া একই পরিবারের চার শ্রমিকের মৃত্যু হইল। চার দিন পরে ঝাড়খণ্ডের নিরশার খোলামুখ কয়লাখনিতে পাথরের চাঁই চাপা পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন পাঁচ জন। ঝাড়খণ্ডে ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠিত হইয়াছে। ফল বাহির হইলে কিছু সুপারিশ মিলিবে, কিন্তু সুরক্ষা মিলিবে কি? বাস্তব ইহাই যে বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, তেলঙ্গানা, মেঘালয়ের খনিগুলিতে প্রতি দিন কয়েক লক্ষ শ্রমিক জীবন বাজি রাখিয়া কয়লা তুলিতে নামেন। তাঁহাদের একটি অংশ আইন-বিধির বৃত্তের বাহিরে— হয় অবৈধ খনিতে কয়লা কাটিতে যান, অথবা বৈধ খনি হইতে কয়লা চুরি করেন। ইহারা অধিকাংশ স্থানীয় মানুষ, চাষের জমি ক্রমশ খনি হইয়া যাওয়ায় অপরাপর জীবিকা হারাইয়াছেন। অবৈধ কয়লা বা অনাহারে মৃত্যু, এই উভয়সঙ্কটে তাঁহারা বাঁচিতেছেন, এবং ভাগ্য মন্দ হইলে কয়লা, পাথর, মাটি চাপা পড়িয়া প্রাণ হারাইছেন। বৈধ খনিতে কাজে নামিয়া বৈধ শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনাও কম ঘটে নাই। প্রতি বার অনুসন্ধান হইয়াছে, এবং নির্দিষ্ট সুরক্ষাবিধি না থাকিবার, অথবা না মানিবার ঘটনা সম্মুখে আসিয়াছে।

শ্রমিকের প্রাণের ঝুঁকির নিরিখে ভারতের খনিগুলি সর্বাধিক ঝুঁকিসম্পন্ন খনির অন্যতম, ২০১৭ সালে প্রতি ছয় দিনে এক জন শ্রমিক প্রাণ হারাইয়াছিলেন। সংসদে পেশ করা তথ্য অনুসারে, ২০১৫ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে ভারতের কয়লাখনিতে ২১০ জন শ্রমিক প্রাণ হারাইয়াছেন, ২০১৯ এবং ২০২০ সালে চুরাশি জনের মৃত্যু হইয়াছে। কত খনির গভীর তলদেশে কত দেহ চাপা পড়িয়া আছে, কে তাহার হিসাব করিবে? কোনও বৎসরই এই মৃত্যু মিছিলে ছেদ পড়ে নাই, এই বৎসর শুরু না হইতেই

এই মর্মান্তিক গণনা শুরু হইয়া গেল। খনি অঞ্চলগুলির সঙ্গে যাঁহাদের কিছুমাত্র পরিচয় রহিয়াছে, তাঁহারাই জানেন যে আইনের শাসন সেই সকল অঞ্চলে একটি ধারণামাত্র। এক দিকে চরম দারিদ্র, বিকল্প জীবিকার অভাব, চটজলদি রোজগারের প্রলোভন, অপর দিকে এক ভয় ও হিংসার বাতাবরণে বসবাস, এই সকল অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের নিকট দৈনন্দিন মৃত্যু-মোকাবিলাকেই 'স্বাভাবিক' করিয়া তুলিয়াছে। বৈধ খনিও বিপন্মুক্ত নহে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার খনিগুলিতেও ঠিকাদার নিয়োগ বাড়িতেছে। প্রশিক্ষণহীন পরিযায়ী শ্রমিকদের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে কাজ করিতে বাধ্য করে ঠিকাদার, এই অভিযোগ বার বার উঠিয়াছে। ভারতের খনিগুলিতে সর্বস্তরের কর্মীর যথাযথ সুরক্ষা প্রশিক্ষণের আর্জি জানাইয়াছিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। ২০১৪ সালের সেই সুপারিশ কতটুকু সম্মান পাইয়াছে, এই বৎসরের নয়টি মৃত্যু তাহা দেখাইল।

প্রতি বারই খনি দুর্ঘটনায় মৃত্যু এবং দেহ উদ্ধারের ঘটনার পরে কিছু শোরগোল হয়, তাহাতে অবৈধ কয়লাচক্রের উৎপাদন ও বিপণন ক্ষণমাত্র থমকায় না। এই বৃহৎ ব্যবস্থার এক দিকে বেপরোয়া শ্রমিক, অপর দিকে বিবেকহীন খরিদ্দার। পথপার্শ্বের ধাবা হইতে স্পঞ্জ আয়রন কারখানা, সকল ব্যবসাকে এই অবৈধ ব্যবস্থা জ্বালানি জুগাইয়া যায়। এই বিপুল অপরাধাশ্রিত ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং প্রশাসনিক দৃঢ়তা প্রয়োজন, তাহার খোঁজ আজও মেলে নাই।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER.COM

তবু বিহঙ্গ

দুর্নীতিমুক্তির পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে, ভারত ফের ফেল করিয়াছে। তবে গত বৎসরের চাহিতে এক ধাপ আগাইয়াছে— একশো আশিটি দেশের মধ্যে তাহার স্থান ছিয়াশি হইতে এই বৎসর হইয়াছে পঁচাশি। এই পরীক্ষায় পাশ নম্বর নাই ঠিকই, কিন্তু ভারত যে গত এক দশক একই স্থানে ঘোরাফেরা করিতেছে, ইহাই কি ব্যর্থতা নহে? প্রশাসনের জটিল ব্যবস্থার কোথায়, কোন সুযোগে দুর্নীতি ঘটিতেছে, তাহা চিহ্নিত করিবার, এবং দৃঢ় হস্তে প্রতিকার করিবার কাজটিতে বহু ছিদ্র রহিয়া গিয়াছে। যথাযোগ্য আইন প্রণয়ন বা সংস্কার হয় নাই, আইন রূপায়ণে প্রশাসনের দৃঢ়তা ও নিরপেক্ষতা দেখা যায় নাই, পুলিশি তদন্তে স্বচ্ছতা ও সক্রিয়তা, আদালতের বিচারকার্যে গতি—কোনও ক্ষেত্রেই অগ্রগতি আশ্বস্ত করিবে না। দুর্নীতি প্রতিরোধের বিধিগুলি খণ্ডিত, বিকৃত প্রয়োগ হইতেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা অসার নিয়মরক্ষায় পর্যবসিত হইতেছে। তাহার কারণগুলি অজানা নহে, আলোচনাও

অনেক হইয়াছে, তবু ‘ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল’ সংস্থাটির বাৎসরিক রিপোর্ট পুনরায় চিন্তা করিতে বাধ্য করে।

দুর্নীতিমুক্তির প্রতি সরকারের আগ্রহের ঘাটতি সম্ভবত সর্বাধিক প্রকট দুর্নীতির বিচারব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতায়। তথ্যের অধিকার কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, মহিলা অথবা সংখ্যালঘুদের অধিকারের সুরক্ষার কমিশনগুলি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে নির্মিত হইয়াছিল, যাহাতে প্রশাসনিক ক্ষমতার অপপ্রয়োগ রুখিতে পারে। দেশের সাধারণ নাগরিক যে কোনও প্রকার দুর্নীতির শিকার হইলে সরাসরি কমিশনের নিকট আবেদন করিতে পারেন। বিশেষত পুলিশের দুর্নীতির বিরুদ্ধে নাগরিকের ক্ষোভ সকল রাজ্যেই প্রবল, মানবাধিকার কমিশনে সর্বাধিক আবেদন তাহার বিরুদ্ধেই জমা পড়িয়াছে বরাবর। প্রশাসনের যে কোনও স্তরের আধিকারিকদের তিরস্কার করিবার ও শাস্তি সুপারিশ করিবার ক্ষমতা কমিশনগুলির রহিয়াছে, স্বতন্ত্র ভাবে দুর্নীতির তদন্তও তাহারা করিতে পারে। এই বিপুল শক্তি থাকিবার জন্যই হয়তো কমিশনগুলিকে ঢাল-তরোয়ালহীন নিধিরাম সর্দার করিতে উদ্যত কেন্দ্র ও রাজ্য, সকল স্তরের সরকার। বহু পদ শূন্য রাখিয়া, অতি গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে শাসক দল-অনুগত ব্যক্তিদের বসাইয়া, আর্থিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ করিয়া, সর্বপ্রকারে কমিশনগুলির স্বাতন্ত্র্য খর্ব করা হইতেছে। আদালতগুলির অবস্থাও তথৈবচ, শূন্য পদ এবং দুর্বল পরিকাঠামোর কারণে বিলম্বিত বিচারই নিয়ম হইয়া উঠিয়াছে। এই ব্যবস্থা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতেছে।

দুর্নীতি লুকাইতে দ্বিতীয় যে উপায় অবলম্বন করিতেছে সকল স্তরের প্রশাসন, তাহা তথ্য গোপন রাখিবার প্রচেষ্টা। গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামসভায় অডিট রিপোর্ট প্রকাশ করিবার সংবিধান-নির্দিষ্ট কর্তব্য এড়াইতে গ্রামসভা আহ্বান করে না, রাজ্য সরকারের অধিকাংশ বিভাগ বরাদ্দ-ব্যয়ের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করে না, কেন্দ্রীয় সরকার বিবিধ সমীক্ষার রিপোর্ট চাপিয়া যায়। দুর্নীতিগ্রস্তদের উপর নজরদারির পরিবর্তে, দুর্নীতি প্রকাশকারীর উপরে নজর রাখিতে কেন্দ্র অধিক আগ্রহী, এমন আরোপকে পুষ্ট করিয়াছে ‘পেগাসাস’ স্পাইওয়্যার ব্যবহারের অভিযোগ। আন্তর্জাতিক সংস্থাটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে, ভারতে সাংবাদিক ও অধিকার কর্মীরা বিপন্ন, তাঁহাদের উপর পুলিশ অথবা সরকারি মদতপ্রাপ্ত দুষ্কৃতীদের আঘাত নামিয়া আসিতেছে। কথাটি অজানা নহে, সংবাদের স্বাধীনতার সূচকে ভারতের স্থান লজ্জাজনক, নাগরিকের মানবাধিকার ভঙ্গ করিবার অভিযোগও বার বার উঠিয়াছে। ইহাই প্রত্যাশিত— মিথ্যার সহিত হিংসার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, মনে করাইয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধী। দিগন্ত আজও অবগুণ্ঠিত, আপন শক্তিতে সত্যের পথে শঙ্কাপূর্ণ যাত্রা শীঘ্র শেষ হইবে না।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER.COM

অরক্ষিত

এক সমীক্ষা জানাইয়াছে, গুরুগ্রাম ও ফরিদাবাদে গাড়ির যন্ত্রাংশ নির্মাণ কারখানায় প্রতি বৎসর প্রায় পাঁচশত শ্রমিকের আঙুল ও হাত কাটা যায়। ঘটনার ভয়াবহতায় শিহরিত হইতে হয়। কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা শ্রমিকের প্রাথমিক এবং অলঙ্ঘ্য অধিকার। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন 'আইএলও'-র মতে, কর্মক্ষেত্র যদি অসুরক্ষিত হয়, তবে কাহাকেও সেইখানে কাজ করানো বাঞ্ছনীয় নহে। সেই আদর্শ পরিস্থিতির প্রস্তাব ভারতের প্রকৃত কর্মক্ষেত্রগুলিতে পরিহাসের ন্যায় শুনায়। আলোচ্য সমীক্ষায় উল্লিখিত কর্মীরা মূলত ঠিকা শ্রমিক— যাঁহাদের না আছে আধুনিক যন্ত্রপাতি চালাইবার দক্ষতা, না তাঁহাদের জন্য নিয়োগকারী সংস্থা কোনও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। ঠিকাদারেরা এই শ্রমিকদের ধরিয়া আনেন, কাজে লাগাইয়া দেন। ইহা স্পষ্ট যে, শ্রমিকদের দক্ষতায় বলীয়ান করা যাঁহাদের কর্তব্য, তাঁহারা সযত্নে দায়িত্ব এড়াইতেছেন, এবং শ্রমিকরাও অরক্ষিত রহিয়া যাইতেছেন।

সঙ্কট যখন স্পষ্ট, তখন সমাধানের পথ বাহির করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা বিধেয়। প্রথমত, যে যন্ত্রে কাজ করাইবার জন্য শ্রমিককে নিয়োগ করা হইতেছে, তাহাতে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে কাজ করিতে গিয়া উপরোক্ত ঝুঁকির আশঙ্কা মোটের উপর কমাইয়া আনা যায়। উহাই বিপদ দূরীকরণের প্রধানতম উপায়। দ্বিতীয়ত, প্রশিক্ষণের কাজটি যথাযথ ভাবে হইতেছে কি না, অর্থাৎ নির্দিষ্ট শ্রমিক নির্দিষ্ট যন্ত্র চালাইবার পক্ষে উপযুক্ত হইয়া উঠিতেছেন কি না, ইহা বুঝিয়া লওয়ার জন্য নজরদারি ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে। বুঝিতে হইবে, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিককে সুরক্ষা দিবার প্রধান স্তম্ভ হইল এই প্রশিক্ষণ, অতএব প্রক্রিয়াটি সর্বাঙ্গীণ ভাবে সুষ্ঠু হওয়া বিধেয়। তৃতীয়ত, এতৎসত্ত্বেও যদি শ্রমিকের কোনও বিপদ ঘটে তবে তাহাকে যথার্থ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এই যাথার্থ্য নিরূপণ করা সহজ নহে। যাঁহার হাত কাটা গেল, সেই অদক্ষ শ্রমিককে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনটি সম্ভবত চাকুরিবিহীন ভাবেই কাটাইতে হইবে— সেই ক্ষতির প্রতিস্থাপনের মাত্রাটিও তদ্রূপ দীর্ঘমেয়াদি হওয়া আবশ্যক।

যদিও, এই পথে বাধা দুস্তর। অভিজ্ঞতা বলিবে, সংস্থাবিশেষে শ্রমিকের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকিলেও তাহা মিলিবার প্রক্রিয়াটি অতি ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। কারণটি বুঝিতে অসুবিধা হয় না। পেশাগত কারণেই শ্রমিকের সামাজিক ক্ষমতা কম— ঠিকা শ্রমিকের ক্ষমতা আরও কম— অতএব তাঁহারা তেমন দর কষাকষি করিতে পারেন না, আইনি লড়াই লড়িবার ক্ষমতাও তাঁহাদের বেশি দূর নাই। এমতাবস্থায়, শ্রমিককে রক্ষাকবচ দিবার দায়িত্বটি রাষ্ট্রের। বিধিবদ্ধ ভাবে তাহাকে সুরক্ষা দেওয়া, বিপদের কালে দ্রুত ক্ষতিপূরণ দেওয়া— অথবা, সংস্থা যাহাতে সেই কাজ করে তজ্জন্য আইনি কাঠামো নির্মাণ করা— ইত্যাকার কর্তব্য তাহাকেই পালন করিতে হইবে। তবে, এই স্থলেও দুশ্চিন্তার কারণ আছে। বর্তমান সরকার সংসদে যে চারটি শ্রমকোড পাশ করাইয়াছে, তাহাতে পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি ও কাজের পরিস্থিতি বিষয়ক পূর্বেকার আইন বহুলাংশে লঘু হইয়াছে; ফলত, কমিতেছে

শ্রমিকদের নিরাপত্তা। সরকার যদি নীতিকাঠামো তৈয়ারি না করে, তবে এই সকল সমাধানকে প্রয়োগক্ষেত্রে তুলিয়া আনা যাইবে না। শ্রমিকের হালও ফিরিবে না।

WBCS BENGALI COMPULSORY PAPER.COM